সব সংস্কারের আগে রাজনৈতিক সংস্কার

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এখন সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ 'সংস্কার'। শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তার প্রধান লক্ষ্য সংস্কার। কোথা থেকে কীভাবে শুরু হবে এই সংস্কার তার রূপরেখা অবশ্য এখনও পরিষ্কার হয়নি জনগণের কাছে।

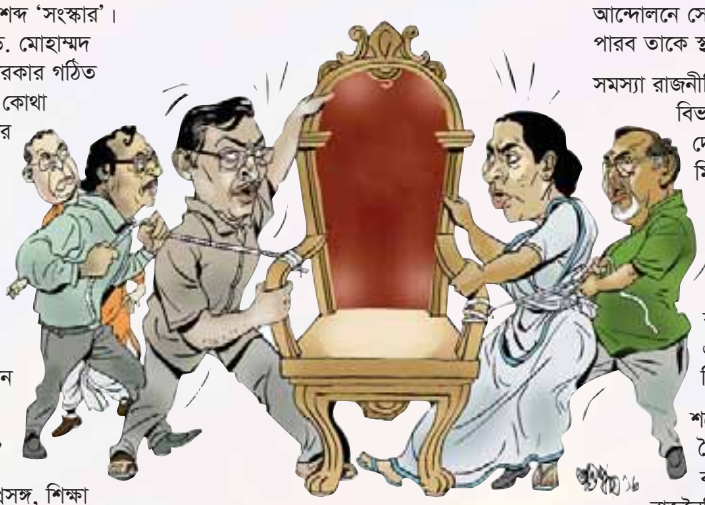

বিগত সরকারে আমলে সড়ক, উড়ালে সেতু, সেতু, বিদ্যুৎ, বন্দর এবং বিমানবন্দরের মতো বাহ্যিক অবকাঠামোখাতে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু একই সাথে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বড় আকারের দুর্নীতির প্রসঙ্গও বারবার এসেছে, এখন আরও বেশি করে আসছে। আসছে আর্থিক খাতের লুটপাট প্রসঙ্গ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত প্রসঙ্গ এবং অতি অবশ্যই ভেঙে পড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জাতীয় পার্টি, গণফোরাম, হেফাজত ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করেন। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় শেষে শিগগিরই সংস্কারের চূড়ান্ত রূপরেখা ঘোষণা করবেন। এই রূপরেখার মধ্যে সংস্কারের কর্মপরিকল্পনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার বলতে আপাতত একটি ভালো নির্বাচন চায় যার মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সেই নির্বাচনই বা কবে হবে? প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেছেন, 'আমরা জনগণের গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে দায়িত্ব পেয়েছি। এখানে বারবার বলা হচ্ছে রাষ্ট্র মেরামত করার। প্রস্তাবনার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জানাবেন তারা রাষ্ট্র মেরামত করার জন্য সরকারকে যৌক্তিক কতদিন সময় দেবেন। তারপর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন আসবে। সংস্কারের ভেতরই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

বোঝা গেল নির্বাচন হতে হলে এই অন্তবর্তী সরকারকে সময় দিতে হবে। এবং সেই সময়টা দেওয়াই যৌক্তিক। কিন্তু মানুষ আসলে কী চায়? শুধু আরেকটি নির্বাচন? আরেকটি নতুন সরকার? অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে এই চাওয়াটা বদলে গেছে। মানুষ ভাবছে তার অধিকার ও সুযোগের সাম্যের কথা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কেমন করে হবে সেই কথা এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে প্রকৃত ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কীভাবে করা যায় সেই কথা।

যে অভ্যুত্থান ঘটে গেছে সেখানে ছিল সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা ও ব্যাপক অংশগ্রহণ। এ অভ্যুত্থান কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ঘটেনি, ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অভ্যুত্থানটি ঘটেছে। তাই মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা ও আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, তাকে মর্যাদা দেওয়া ও স্থায়ী করাই এখন বড় কর্তব্য। এবং সেটা করতে গেলেই সংস্কারের প্রসঙ্গ আসবে।

আমাদের শাসক কাঠামোর সমস্যা বিভাজন ও এক কেন্দ্রিকতা। কোনো ইস্যুতেই শাসক দল ও বিরোধী পক্ষকে একমত হতে দেখা যায় না। কোনো একটি প্রশ্নে যদি শাসক ও বিরোধী, উভয় পক্ষই সহমত হয়, দেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় কোনো অবস্থান গ্রহণ করে সেটাই গণতন্ত্রের পক্ষে সুসংবাদ। বাংলাদেশের মানুষ এই সুসংবাদ কখনও সেভাবে পায়নি। রাজনীতির বেলায় এই সংস্কারটি মানুষ চায়। নির্বাচনের মাধ্যমে যে জিতল তার সব হয়ে গেলে এবং যে হারল সে সব হারালো; এই প্রবণতার সংস্কার না হলে বাকি কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কার আসবে না।

যখন যে দল ক্ষমতা পায় সে আর কাউকে কিছু দিতে চায় না। সব দখলে নেয়। বল প্রয়োগের এই প্রবণতা দেখে বিদ্বেষ আর হিংসার চর্চা বাড়ে, আধিপত্ত চর্চা বাড়ে। রাজনীতি আমাদের সবটা নিয়ন্ত্রণ করে। আর চোখে কাপড় বেঁধে আমরা সব মেনে নেই। আমরা সাধারণ মানুষ সামগ্রিক সচেতনতার দিকে এগিয়ে না গিয়ে স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছি নিজেদের। আর চারপাশের ব্যবস্থাকে 'সিস্টেম' নাম দিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছি যে, যেখানে নিপীড়ন বা বৈষম্যের শিকার হলেও আমাদের বিরোধিতার সুর আর থাকছে না। এবার সরকার বিরোধী আন্দোলনে সেই সুরটা ফিরেছে, কিন্তু আমরা কি পারব তাকে স্থায়ী রূপ দিতে?

সমস্যা রাজনীতিতে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এখানে বিভাজিত শত্রু ও মিত্রের মধ্যে। এ দেশে রাজনীতি মানেই শত্রু ও মিত্রের বিভাজন। দীর্ঘদিনের এই চর্চা এতটাই হিংস্র যে - খুন করতে, লুট করতে, প্রতিপক্ষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে, ঘরে ঢুকে প্রতিপক্ষের শিশু হত্যা করতে বুক কাঁপে না। এ অবস্থা আমরা এই পটপরিবর্তনের পরও এমন কিছু ঘটনা দেখলাম।

শত্রুকে প্রাণে মারার জন্য সব সময় তৈরি থাকে আমাদের রাজনীতি। বলা হয় এটাই নাকি তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব। হিংসা, তার চরম অর্থ হত্যা-সহ যাবতীয় নিষ্ঠুরতা এভাবে এদেশে এক বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করেছে এবং সেই হিংসাই এখানে রাজনৈতিক অস্তিত্বের মূলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক বলতে এখানে বোঝা হয় শত্রু ও মিত্রের আলাদা দল তৈরি করে তাদের পরস্পরকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত রাখা। রাজনৈতিক নেতাদের এই ধারণার মাধ্যমেই এ দেশের গণতন্ত্রকে বুঝতে হবে। কারণ আমাদের রাজনীতির ভিত্তিমূলে আছে শত্রু-মিত্র বিভাজন। বিভাজনের দাঙ্গাবাজির রাজনীতিতে মানুষ বাস করছে এক অবক্ষয়িত সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিবেশে।

জনগণের জন্য রাজনীতি তাই শেষ পর্যন্ত ত্রাস, আতঙ্ক, ভীতির রাজনীতি; মানুষ তাই ব্যস্ত থাকে সম্ভাব্য মৃত্যু, হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের দলাদলির সর্বগ্রাসী প্রভাবের কথা আমরা কমই আলোচনা করি এবং আমাদের শিক্ষিত নাগরিক সমাজও সেভাবে নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়ি করে। তারা আরও বেশি করে দলাদলি শত্রু ও মিত্রের বিভাজনকে একটা নির্দিষ্ট চেহারা দেয়। শত্রু-মিত্র, আমরা-ওরা'য় বিভাজিত রাজনীতি তাই এখানে পরিচালিত হয়ে আসছে বৈষম্যমূলক, পক্ষপাতমূলক ভাবে যার অনিবার্য পরিণতি হিংসা ও বিভেদ। ব্যক্তির বা নাগরিকের অস্তিত্ব সীমিত, খণ্ডিত। হত্যা, বিরোধ, সংঘাতের এই পরিবেশে নাগরিকদের পরস্পরনির্ভরতা সম্ভব নয়। শত্রু-মিত্রের রাজনীতি তা হতেও দেয় না। তাই আমরা বলতে পারি দলাদলি, শত্রু-মিত্র, হিংস্রতা গণতন্ত্রের এক ক্লোজার সৃষ্টি করেছে যেখান থেকে বের হতে পারলেই কেবল আসল সংস্কারের পথে হাঁটতে পারবে বাংলাদেশ।

লেখক: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক